কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২২

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৯

সূরা মারইয়াম (৫১-৬৫)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম খনীলুল্লাহ আ.)-এর আলোচনা ছিল। এ আয়াত থেকে হযরত মুসা কালীমুল্লাহ আ.)-এর কথা শুরু হয়েছে। এটি এই সূরার চতুর্থ ঘটনা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহান আদর্শ বর্ণনার মাধ্যমে আরবের মুশরিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে তার উম্মত হওয়ার দাবিদার ইহুদিদেরকে সাবধান করা হয়েছে। যদি ইহুদিরা নিজেদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মত বলে দাবি করে তবে তাদের কর্তব্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম 33 -এর প্রতি ঈমান আনা এবং তীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা ।

ইরশাদ হয়েছে হে রাসূল! এই কিতাবে হ্যরত মূসা (আ.)-এর উল্লেখ করুন: নিয় তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত, পছন্দনীয়, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

যার কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী আসে তিনি আল্লাহ তা'আলার নবী, নবীদের মধ্যে যাদের বিশেষ ভূমিকা থাকে, যার নিকট কিতাব আসে, যিনি শরিয়ত রাখেন, তিনি হন নবী এবং রাসূল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা"আলার নবী ও রাসূল ছিলেন এবং পাচজন বিশিষ্ট নবীও রাসূলের মধ্যে ছিলেন তিনি অন্যতম । তারা হলেন, হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ সাঃ

وَ اذۡکُرۡ فِی الۡکِتٰبِ مُوۡسٰۤی ۫ اِنَّہٗ کَانَ مُخۡلَصًا وَّ کَانَ رَسُوۡلًا نَّبِیًّا ﴿۵۱﴾

৫১. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে মূসাকে, তিনি ছিলেন বিশেষ মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী।

مُخۡلَصًا এর মানে হচ্ছে, "বিশেষভাবে মনোনিত করা, একান্ত করে নেয়া।" [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি মুখলিস যে ব্যক্তি একান্তভাবে আল্লাহর জন্য আমল করে, মানুষ এর প্রশংসা করুক এটা চায় না। [ইবন কাসীর] মূসা আলাইহিস সালাম এ ধরনের বিশেষ গুণে বিশেষিত থাকায় মহান আল্লাহ তাকে তার কাজের পুরস্কারস্বরূপ একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্যে খাঁটি করে নেন তিনি পরম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। নবীগণই বিশেষভাবে এ গুণে গুণান্বিত হন, যেমন- কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আমি তাদেরকে (নবীদেরকে) আখেরাতের স্মরণ করা কাজের জন্যে একান্ত করে নিয়েছি।" [সূরা ছোয়াদঃ ৪৬]

وَ نَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَ قَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

৫২. আর তাকে আমরা ডেকেছিলাম তূর পর্বতের ডান দিক থেকে এবং আমরা অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম।

এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়া, মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এ নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। তুর পাহাড়ের ডানদিকে মুসা আলাইহিস সালামের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তূর পাহাড়ের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তূর পাহাড় তার ডান দিকে ছিল।

وَ وَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَاۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

৫৩. আর আমরা নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে।

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

৫৪. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইসমাঈলকে, তিনি তো ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী;

ওয়াদা পালনে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহর সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাই এর জন্যে পেশ করে দেবেন। এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন।

وَ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ ۪ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

৫৫. তিনি তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তার রব-এর সন্তোষভাজন।

ইসমাইল আলাইহিস সালামের আরও একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। কুরআনে সাধারণ মুসলিমদেরকে বলা হয়েছেঃ “তোমরা

নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর।" [সূরা আত-তাহরীম: ৬] এ ব্যাপারে ইসমাঈল 'আলাইহিস সালাম বিশেষ গুরুত্বসহকারে ও সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত ছিলেন। তিনি চাননি তার পরিবারের লাকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করুক। এ ব্যাপারে তিনি কোন ছাড় দেন নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ ঐ পুরুষকে রহমত করুন যিনি রাতে সালাত আদায়ের জন্য জাগ্রত হলো এবং তার স্ত্রীকে জাগালো তারপর যদি স্ত্রী জগতে গড়িমসি করে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ ঐ মহিলাকে রহমত করুন যিনি রাতে সালাত আদায়ের জন্য জাগ্রত হলো এবং তার স্বামীকে জাগালো তারপর যদি স্বামী জাগতে গড়িমসি করে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিল। [আবু দাউদ: ১৩০৮, ইবন মাজাহ: ১৩৩৬]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যদি কোন লোক রাতে জাগ্রত হয়ে তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করে তাহলে তারা দু'জনের নাম অধিক হারে আল্লাহর যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিনী মহিলাদের মধ্যে লিখা হবে।' [আবু দাউদ: ১৩০৯, ইবন মাজাহ: ১৩৩৫]

وَ اذۡکُرۡ فِی الۡکِتٰبِ اِدۡرِیۡسَ ۫ اِنَّهٗ کَانَ صِدِّیۡقًا نَّبِیًّا ﴿۵۶﴾

৫৬. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইদরীসকে, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী;

وَّ رَفَعۡنٰهُ مَکَانًا عَلِیًّا ﴿۵۷﴾

৫৭. আর আমরা তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইদরীস আলাইহিস সালামকে উচ্চ মর্তবায় সমুন্নত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাকে উচ্চ স্থান তথা আকাশে অবস্থান করার ব্যবস্থা করেছি। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যখন আমাকে আকাশে উঠানো হয়েছিল মি'রাজের রাত্রিতে আমি ইদরীসকে চতুর্থ আসমানে দেখেছি।' [তিরমিযী: ৩১৫৭]

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ইদরীস আলাইহিস সালামকে জীবিত অবস্থায় আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেনঃ এটা ক'ব আল-আহবারের ইসরাঈলী বর্ণনা। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। কাজেই আকাশে জীবিত অবস্থায় তুলে নেয়ার বিষয়টি স্বীকৃত নয়। আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, তাকে উঁচু স্থান জান্নাতে দেয়া হয়েছে। অথবা তাকে নবুওয়াত ও রিসালাত দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ * وَ مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۫ وَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْرَآءِيْلَ ۫ وَ مِمَّنْ هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا ﴿۵۸﴾

৫৮. এরাই তারা, নবীদের মধ্যে আল্লাহ যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন, আদমের বংশ থেকে এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। আর ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত, আর যাদেরকে আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম; তাদের কাছে দয়াময়ের আয়াত তিলাওয়াত করা হলে তারা লুটিয়ে পড়ত সিজদায়(১) এবং কান্নায়।

[এই আয়াতটি সিজাদাহ এর আয়াত]

অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, “বলুন, তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের কাছে যখন এটা পড়া হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।” [সূরা আল-ইসরা: ১০৭–১০৯]

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং নবীদের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও সৎকর্মশীলদের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার এ সূরা পড়ে সিজদা করলেন এবং বললেন, সিজদা তো হলো, কিন্তু ক্রন্দন কোথায়!

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

৫৯. তাদের পরে আসল অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। কাজেই অচিরেই তারা ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হবে।

خلف শব্দে লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরী, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যাবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরী এবং উত্তম সন্তান-সন্ততি। এখানে সাকিনযুক্ত হওয়ায় এর অর্থ হচ্ছে: খারাপ উত্তরসূরী। [ফাতহুল কাদীর] এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ষাট বছরের পর থেকে খারাপ উত্তরসূরীদের আবির্ভাব হবে, যারা সালাত বিনষ্ট করবে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, তারা অচিরেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জাহান্নামে নিপতিত হবে। তারপর এমন কিছু উত্তরসূরী আসবে যারা কুরআন পড়বে অথচ তা তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নভাগে যাবে না। আর কুরআন পাঠকারীরা তিন শ্রেণীর হবে: মুমিন, মুনাফিক এবং পাপিষ্ঠ। বর্ণনাকারী বশীর বলেনঃ আমি ওয়ালিদকে এ তিন শ্রেণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ কুরআন পাঠকারী হবে অথচ সে এর উপর কুফরকারী, পাপিষ্ঠ কুরআন পাঠ্যকারী হবে যে এর দ্বারা নিজের

রুটি-রোজগারের ব্যবস্থা করবে। আর ঈমানদার কুরআন পাঠ্যকারী হবে যে এর উপর ঈমান আনবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩৮, সহীহ ইবন হিব্বান: ৩/৩২, ৭৫৫]

মুজাহিদ বলেনঃ কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন সালাতের প্রতি কেউ ক্রুক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে। এ আয়াতে "সালাত নষ্ট করা" বলে বিশিষ্ট তফসীরবিদদের মতে, অসময়ে সালাত পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ সময়সহ সালাতের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা সালাত নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে 'সালাত নষ্ট করা' বলে জামা'আত ছাড়া নিজে গৃহে সালাত পড়া বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

খলীফা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেনঃ আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি সালাত নষ্ট করে সে দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশী নষ্ট করবে। [মুয়াত্তা মালেকঃ ৬]

তদ্রুপ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে সালাতের আদব ও রোকন ঠিকমত পালন করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কবে থেকে এভাবে সালাত আদায় করছ? লোকটি বললঃ চল্লিশ বছর ধরে। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ তুমি একটি সালাতও পড়নি। যদি এ ধরনের সালাত পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত আদর্শের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।" [নাসায়ীঃ ৩/৫৮, সহীহ ইবন হিব্বানঃ ১৮৯৪]

অনুরূপভাবে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঐ ব্যক্তির সালাত হয় না, যে সালাতে 'একামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকু ও সেজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সেজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার সালাত হয় না। [তিরমিযীঃ ২৬৫]

মোটকথাঃ সালাত আদায় ত্যাগ করা অথবা সালাত থেকে গাফেল ও বেপরোয়া হয়ে যাওয়া প্রত্যেক উম্মতের পতন ও ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ। সালাত আল্লাহর সাথে মুমিনের প্রথম ও প্রধানতম জীবন্ত ও কার্যকর সম্পর্ক জুড়ে রাখে। এ সম্পর্ক তাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। এ বাঁধন ছিন্ন হবার সাথে সাথেই মানুষ আল্লাহ থেকে দূরে বহুদূরে চলে যায়। এমনকি কার্যকর সম্পর্ক খতম হয়ে গিয়ে মানসিক সম্পর্কেরও অবসান ঘটে। তাই আল্লাহ একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে এখানে একথাটি বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল উম্মতের বিকৃতি শুরু হয়েছে সালাত নষ্ট করার পর। হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বান্দা ও শির্কের মধ্যে সীমারেখা হলো সালাত ছেড়ে দেয়া। [মুসলিম: ৮২] আরও বলেছেনঃ "আমাদের এবং কাফেরদের মধ্যে একমাত্র সালাতই হচ্ছে পার্থক্যকারী বিষয়, (তাদের কাছ থেকে এরই অঙ্গীকার নিতে হবে) সুতরাং যে কেউ সালাত পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল।" [তিরমিযী: ২৬২১]

'কুপ্রবৃত্তি' বলতে বুঝায় এমন কাজ যা মানুষের মন চায়, মনের ইচ্ছানুরূপ হয় এবং যা থেকে সে তাকওয়া অবলম্বন করে না। যেমন হাদীসে এসেছে, "জান্নাত ঘিরে আছে অপছন্দনীয় বিষয়াদিতে, আর জাহান্নাম ঘিরে আছে কুপ্রবৃত্তির চাহিদায়" [মুসলিম: ২৮২২] অনুরূপভাবে এখানেও 'কুপ্রবৃত্তি' বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে গাফেল করে দেয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

বলেনঃ বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লেখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। [কুরতুবী]

আরবী ভাষায় غي শব্দটি رشد এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رشد বলা হয়। অপরদিকে প্রত্যেক অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর বিষয়কে غي বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেনঃ 'গাই' জাহান্নামের এমন একটি গর্তের নাম যাতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক আযাবের সমাবেশ রয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'গাই' জাহান্নামের এমন একটি গুহা জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

৬০. কিন্তু তারা নয়—যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿٦١﴾

৬১. এটা স্থায়ী জান্নাত, যে গায়েবী প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন। নিশ্চয় তার প্রতিশ্রুত বিষয় আসবেই।

এটি তাদের ঈমান ও ইয়াক্বীনের দৃঢ়তা যে, তারা জান্নাত তো দেখেইনি বরং আল্লাহর অদৃশ্যভাবে দেওয়া প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে জান্নাত পাওয়ার আশায় ঈমান ও আল্লাহ-ভীতির রাস্তা অবলম্বন করেছে।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا ﴿٦٢﴾

৬২. সেখানে তারা 'সালাম' তথা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে তাদের রিযিক।

لغو বলে অনর্থক ও আসার কথাবার্তা গালিগালাজ একং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। যেমন দুনিয়াতে কখনও কখনও মানুষ এটা শুনে থাকে। [ইবন কাসীর] জান্নাতবাসিগণ এ থেকে পবিত্র থাকবে। কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবেনা। অন্য আয়াতে এসেছে, "সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার বা

পাপবাক্য, ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ বাণী ছাড়া।” [সূরা আল-ওয়াকি আহ: ২৫–২৬] জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে। তারা দোষ-ত্রুটিমুক্ত হবে। জান্নাতে মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে। তার মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হবে এই যে, সেখানে কোন আজেবাজে, অর্থহীন ও কটু কথা শোনা যাবে না। তারা শুধু তা-ই শুনবে যা তাদেরকে শান্তি দেয়। [ফাতহুল কাদীর]

জান্নাতে সুযোদয়, সুর্য্যস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদা সর্বদা একই প্রকার আলো থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন, রাত্রি ও সকাল সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই রকম সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। [ফাতহুল কাদীর] একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতিগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে। এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলেঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দশীল। হাদীসে এসেছে, ‘শহীদগণ জান্নাতের দরজায় নালাসমূহের উৎপত্তিস্থলে সবুজ গম্বুজে অবস্থানরত রয়েছে, তাদের নিকট জান্নাত থেকে সকাল-বিকাল খাবার যায়’ [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৬৬]

অন্য হাদীসে এসেছে, “প্রথম দলটি যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের রূপ হবে চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদের রূপ। সেখানে তারা থুথু ফেলবে না, শর্দি-কাশি ফেলবে না, পায়খানা-পেশাব করবে না। তাদের প্লেট হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের সুগন্ধি কাঠ হবে ভারতীয় উদ কাঠের, তাদের ঘাম হবে মিশকের। তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে দু’জন করে স্ত্রী, যাদের সৌন্দর্য এমন হবে যে, গোস্তের ভিতর থেকেও হাঁড়ের ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। মতবিরোধ থাকবে না, থাকবেনা ঝগড়া-হিংসা হানাহানি, তাদের সবার অন্তর এক রকম হবে। সকাল বিকাল তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে।” [বুখারী: ৩২৪৫] কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খায়েশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসর্বদা উপস্থিত থাকবে।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

৬৩. এ সে জান্নাত, যার অধিকারী করব আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে।

তাকওয়ার অধিকারীদের জন্যই জান্নাত, তারাই জান্নাতের ওয়ারিশ হবে একথা এখানে যেমন বলা হয়েছে কুরআনের অন্যত্রও তা বলা হয়েছে, সূরা আল-মুমিনুনের প্রারম্ভে মুমিনদের গুণাগুণ বর্ণনা করে শেষে বলা হয়েছে: “তারাই হবে অধিকারী—অধিকারী হবে ফিরদাওসের যাতে তারা স্থায়ী হবে। [১০–১১] আরো এসেছে, “তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তকীদের জন্য। [সূরা আলে। ইমরান: ১৩৩] অন্যত্র বলা হয়েছে, “আর যারা তাদের প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।” [সূরা আযযুমারঃ ৭৩]

وَ مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمۡرِ رَبِّکَ ۚ لَهٗ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡنَا وَ مَا خَلۡفَنَا وَ مَا بَیۡنَ ذٰلِکَ ۚ وَ مَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیًّا ﴿۶۴﴾

৬৪. আর আমরা আপনার রব-এর আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না; যা আমাদের সামনে ও পিছনে আছে ও যা এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী তা তারই। আর আপনার রব বিস্মৃত হন না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ অত্যন্ত দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ সর্বক্ষণ অহীর অপেক্ষা করতেন। এর সাহায্যে তারা নিজেদের পথের দিশা পেতেন এবং মানসিক প্রশান্তি ও সান্ত্বনাও লাভ করতেন। অহীর আগমনে যতই বিলম্ব হচ্ছিল ততই তাদের অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় জিবরীল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সাহচর্যে আগমন করলেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলকে বললেনঃ আপনি আমাদের নিকট আরো অধিকহারে আসতে বাধা কোথায়? তখন এ আয়াত নাযিল হয় । [বুখারী: ৪৭৩১] একথা ক'টির মধ্যে রয়েছে এত দীর্ঘকাল জিবরীলের নিজের গরহাজির থাকার ওজর, আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনাবাণী এবং এ সংগে সবর ও সংযম অবলম্বন করার উপদেশ ও পরামর্শ।

বলা হয়েছে, আপনার রব বিস্মৃত হবার নয়। তিনি ভুলে যান না। জিবরীল বেশী বেশী নাযিল হলেই যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে ভুলেননি বা তার বান্দাদের জন্য বিধান দেয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আসবে নইলে নয় ব্যাপারটি এরূপ নয়। [ফাতহুল কাদীর] মহান আল্লাহ তার ওয়াদা পূর্ণ করবেন। তার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন এবং তার রাসূল ও ঈমানদারদেরকে রক্ষা করবেন। এটাই মূল কথা। তিনি কোন কিছুই ভুলে যান না। সুতরাং তাড়াহুড়ো বা জিবরীলকে না দেখে অস্থির হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল আর যা হারাম করেছেন তা হারাম। যে সমস্ত ব্যাপারে চুপ থেকেছেন কোন কিছু জানাননি সেগুলো নিরাপদ। সুতরাং সে সমস্ত নিরাপদ বিষয় তোমরা গ্রহণ করতে পার; কেননা আল্লাহ ভুলে যাওয়া কিংবা বিস্মৃতি হওয়ার মত গুণে গুণান্বিত নন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন।' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৭৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হালাল বা হারাম ঘোষণা করেছেন সেগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকেই। কারণ, রাসূল নিজ থেকে কিছুই করেননি। শরীআতের প্রতিটি কর্মকাণ্ড আল্লাহর নির্দেশেই তিনি প্রবর্তন করেছেন।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَيۡنَهُمَا فَاعۡبُدۡهُ وَ اصۡطَبِرۡ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿۶۵﴾

৬৫. তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, সে সবের রব। কাজেই তারই ইবাদাত করুন এবং তার ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাকুন। আপনি কি তাঁর সমনামগুণসম্পন্ন কাউকেও জানেন?

اصطبار শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। [ফাতহুল কাদীর] এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদাতের স্থায়িত্ব পরিশ্রম সাপেক্ষ। ইবাদতকারীর এ জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত। আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায়, তাঁর আদেশ ও নিষেধ সবরের সাথে পালন করুন।

মূলে سَمِيًّا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, "সমনাম"। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ' তথা উপাস্য বলত; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ রাখেনি। এ জন্যেই বলা হচ্ছে যে, কেউ কি আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে এ নামে ডেকেছে? সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহর কোন সমনাম নেই।

মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে এ স্থলে سَمِيًّا শব্দের অর্থ অনুরূপ সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য, সমকক্ষ কেউ নেই। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, তোমাদের জানা মতে দ্বিতীয় কোন আল্লাহ আছে কি? যদি না থাকে এবং তোমরা জানো যে নেই, তাহলে তোমাদের জন্য তাঁরই বন্দেগী করা এবং তাঁরই হুকুমের দাস হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে কি? তোমরা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কোন নাম ও গুণ অন্যকে দিও না। সৃষ্টিজগতের কোন নাম-গুণও তাঁর জন্য সাব্যস্ত করো না। সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণগুলো তো তারই জন্য। তিনিই এসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার বেশী হকদার। যাদের কোন গুণ নেই, কাজ নেই, যাদের নামের বাস্তবতাও নেই তারা নিজেরাও অস্তিত্বহীন হওয়াটাই বেশী যুক্তিযুক্ত। [ইবনুল কাইয়্যেম, আসসাওয়ায়িকুল মুরসালাহ: ৩/১০২৮]

তাফসীর সমাপ্ত

প্রস্তুতি সহায়ক এই নোট তৈরী করতে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ, বিভিন্ন ভাই-বোনের দারস/নোট, ইন্টারনেট থেকে তথ্য ইত্যাদির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।
আমাদের এই নোটগুলোতে কোনো ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হলে অথবা অন্য কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের জানাবেন ইনশাআল্লাহ।

ফুটনোট

সূরা মারইয়ামে দশজন নবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেক নবীর কিছু না কিছু বিশেষ গুণাবলি ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আশ্বিয়ায়ে কেরামের ইজ্জত ও সম্মান জ্ঞাপন করা বাঞ্চনীয় । উক্ত নবীগণ হলেন- ১. হ্যগ্ীত জাকারিয়া (আ.) ২. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) ৪. হযরত ঈসা (আ.) ৫. হযরত ইসহাক (আ.) ৬. হযরত ইয়াকূব (আ.) ৭. হযরত ইসমাঈল (আ.) ৮. হযরত মূসা (আ.) ৯. হযরত হারূন (আ.) ও ১০, হযরত ইদ্রীস (আ.)।

এ আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর পাচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যথা-
১. তিনি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও পছন্দনীয় ছিলেন।
২. তিনি রাসূল ও নবী ছিলেন।
৩. তার সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন।
৪. আল্লাহ তা'আলা তাকে নৈকট্যধন্য করেছেন।
৫. হযরত মূসা (আ.)-এর আরজি কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তার ভাই হারূন (আ.)-কে নবী মনোনীত করেছেন। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

পরিবার পরিজন থেকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া শুরু করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। যেমনটা ইসমাঈল আঃ নিজের পরিবারকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং নবীদের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও সৎকর্মশীলদের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার এ সূরা পড়ে সিজদা করলেন এবং বললেন, সিজদা তো হলো, কিন্তু ক্রন্দন কোথায়!

আল্লাহ্ যেন আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যান যে তাঁর আয়াত সমূহ পড়লে আমরা সিজদাহে লুটিয়ে পড়তে পারি আখিরাতের ভয়ে কান্না আসে।